Vol. 29 | No. 2 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বঙ্কিম-উপন্যাসে রঙ্গরস

Volume	29
Issue	2
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	February 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i2.1
Pages	1-38
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বঙ্কিম-উপন্যাসে রঙ্গরস

নীলিমা ইব্রাহিম

সুসাহিত্যিক, দার্শনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ নিসর্গসচেতন ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও ব্যঙ্গ-চিত্র রচয়িতা। রম্যরচনাও তাঁর বিশেষ পদচারণার ক্ষেত্র। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মে আস্থাবান, ধর্মাচারনিষ্ঠ গর্বিত ব্রাহ্মণ বঙ্কিম আবার স্বচ্ছদৃষ্টি প্রগতিশীল শুধু চিন্তায় নয়, মন-মানসিকতা-মননেও। বঙ্কিম-গুণাবলীর পরিচয় প্রদান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে হাল্কা মনে রসাপ্লুত হয়ে যে-সব অপূর্ব রঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টি করেছেন তারই কিছু উল্লেখ এ-নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিম স্থূল রস-রসিকতায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। অপরপক্ষে উপন্যাসের জগতে চরিত্র-বিকাশ ও পরিবেশ-পরিস্ফুটনে তিনি বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গীরও পক্ষপাতী ছিলেন না। নির্ভেজাল হাস্যরসে এবং নির্দোষ কৌতুকে তাঁর উপন্যাস একান্ত ভাবেই সমৃদ্ধ। বঙ্কিম-সমকালে তৎকালীন বঙ্গসমাজে যত্র-তত্র স্থূল রসিকতা পরিবেশিত হতো। বাংলার মিলটনও এর থেকে অব্যাহতি পান নি, সম্ভবতঃ চাননি। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' এই রস-পরিবেশনে প্রাণ-চাঞ্চল্য লাভ করেছে। এ-ছাড়া তৎকালীন রসিক-চূড়ামণি দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরিহর আত্মা। উভয়ের বন্ধুত্ব শুধু ঐতিহাসিক সত্য নয়, বহু কিম্বদন্তীরও জন্ম দিয়েছে। শৈশবে আমার পিতৃদেবের কাছে গল্প শুনেছি কোনও এক সময়ে বঙ্কিম ও দীনবন্ধু একই সঙ্গে খুলনায় কর্মরত ছিলেন। দীনবন্ধু পোস্টাল সুপার আর বঙ্কিম ডেপুটি কালেক্টর। বঙ্কিমের আদালতে কোনও এক রমণী শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনয়ন করেন। মামলায় বাদিনীকে উপস্থিত হতে বলা হয়। বাদিনী রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারের কন্যা ও বধূ এবং সে-কারণে পর্দানশীলা।

আদালত কক্ষে শুধু হাকিম, উকিল ও পেস্কার উপস্থিত। লজ্জাবতী বাদিনী কথা বলেন না শুধু ঘোমটা টানছেন অথচ তিনি বেশ সুঠাম দেহের অধিকারিণী। অকস্মাৎ হাকিম মামলা স্থগিত ঘোষণা করে আদালত কক্ষ ত্যাগ করলেন। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞ হাকিমী-দৃষ্টিতে বাদিনীর মুখে দীনবন্ধুর গোঁফ জোড়া দেখতে পেয়েছিলেন। দীনবন্ধু স্বরসিকতায় পুলকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে বশে আনতে নিমচাঁদের পিতার রীতিমত আয়াস স্বীকার করতে হয়েছিল। আমার বাবা এ-কাহিনী শুনেছিলেন ঐ আদালতে উপস্থিত সরকারী উকিল, তাঁর শ্বশুর রায়বাহাদুর বিপিন-বিহারী সেনগুপ্তের মুখে। অবশ্য এ-কাহিনী দানা বাঁধবার জন্য কে কতোটা রঙ্ চড়িয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই, তবে বঙ্কিম-দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব আমরণ স্থায়ী হয়েছিল।

এ-কাহিনী অবতারণার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা প্রয়োজন মনে করি। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের রস-চেতনার ধারা ও রীতির ব্যবধানের ওপরই আমি ইঙ্গিত করতে চাই। কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিম ব্যঙ্গপ্রিয় কিন্তু সেখানেও পরিশীলিত রুচির ব্যাঘাত কোথায়ও ঘটেনি। আমার আলোচ্য বিষয় বঙ্কিম-উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ এবং উপন্যাসের ভাব, ভাবনা ও চরিত্রের ওপর এ রঙ্গ-রস পরিবেশন নির্ভরশীল। সুতরাং সকল উপন্যাসে এর প্রয়োগ সমান নয়। আমি উপন্যাসের রচনাকালের ভিত্তিতে এ-আলোচনায় প্রয়াসী, কারণ সামাজিক ঐতিহাসিক ধর্মীয় বা বিশেষ আদর্শ প্রচারধর্মী উপন্যাসের ব্যবধান বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এ-আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ করা সম্ভবপর নয়। কারণ সর্বত্র এ-রস পরিবেশিত হলেও সামাজিক উপন্যাসেই এর আধিক্য, কারণ সুযোগ সেখানেই বেশী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। বাংলায় মোগল-পাঠানের সংঘর্ষের ভিত্তিতে এর আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে। ইতিহাসের সত্যতা বিচার আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। অন্যপক্ষে স্কটের 'আইভ্যান হো'র সঙ্গে এর কাহিনী, উপাখ্যানের আরম্ভের বর্ণনা, চরিত্র-স্থষ্টি, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংলাপের এতো মিল যে, যে-কোনও সচেতন পাঠক একের ওপর অন্যের প্রভাব সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য সাহিত্য-সম্রাট নাকি বলেছিলেন তিনি দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বে আইভ্যান হো পাঠ করেন নি। মহৎ ঋষি-বাক্য অবিশ্বাস

করলে মহাপাতক হবে। কিন্তু বিশ্বাসের সকল দ্বারই অবরুদ্ধ। যাই হোক, এ-আলোচনা আমাদের বিচার্য বিষয় বহির্ভূত।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে সর্বাধিক রস পরিবেশিত হয়েছে রসরাজ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে অবলম্বন করে। তিনি বিমলাকে দেখে মন্তব্য করেছেন, "দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত; মদন আগুন যত শীতল হইতেছে দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" (বঙ্কিম-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ২য় প্রকাশ ১৩৬৩, পৃ. ৬০) এই রসিকতা-সূত্রে বিমলা তাঁর নাম রাখেন, "রসিকরাজ রসোপাধ্যায়"। গজপতির রূপ বর্ণনায় পাই, "মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্কফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম। (ব. র., পৃ. ৬৯) দাসী আশমানিও গজপতিকে নিয়ে নানারকম রঙ্গরহস্য করতেন। তাকে দেখে গজপতি ভাবতেন, "আমার তুল্য ব্যক্তির ভারতে কেবল লীলা করিতে আসা; এই আমার শ্রীবৃন্দাবন, আশমাণি আমার রাধিকা।" আশমানিও রসিকা; মদনমোহন পাইয়া বানর পোষার সাধ মিটাইয়া লইত। বিমলাও সন্ধান পাইয়া কখনও বানর নাচাইতে যাইতেন। দিগ্‌গজ মনে করিতেন, "এই আমার চন্দ্রাবলী জুটিয়াছে; না হবে কেন? যে ঘৃতভাণ্ড ঝাড়িয়াছি, ভাগ্যে বিমলা জানে না, ওটি আমার শোনা কথা।" (ব. র., পৃ. ৭১)

এ রসসিঞ্চন শুধু মার্জিত এবং পরিশীলিত নয়, বিদ্বান দরবারে পরিবেশিত। আশমানির সামনে গজপতির আহার্য গ্রহণ নির্মল হাসিতে আমাদের মন কেড়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি সহানুভূতির জারক রসে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। বিদ্যা দিগ্‌গজের স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকের যত্র-তত্র প্রয়োগ বিদগ্ধ মনে রস সিঞ্চন করে। তবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভাব-গম্ভীর সংযত প্রেমের উপাখ্যানে সহজ রঙ্গরসের অবতারণা সহজসাধ্য নয়। এ-কারণে রসরাজ রসোপাধ্যায়কে নিয়েই এ-উপন্যাসের কৌতুকের সীমাবদ্ধতায় আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাস বহুল প্রশংসিত, সমকালীন সমাজে চমক সৃষ্টিকারী অনবদ্য কাব্য-উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। এখানে দার্শনিক মনস্তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। বনজ কুসুমবৃক্ষ গৃহস্থের অঙ্গনে ক্ষণিকের শোভা

বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়না। এখানেও আমরা চিরঞ্জয়ী নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব দেখতে পাই কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিতে কপালকুণ্ডলা বাংলা উপন্যাস জগতে আজও অদ্বিতীয়া। ভাব-গম্ভীর দার্শনিক বিষয়ের অবতারণার জন্য সহজ কৌতুকের সুযোগ এ-উপন্যাসে সীমিত। কিন্তু শিল্পী আমাদের বঞ্চিত করেন নি। দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হবার পর পথিমধ্যে মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়—"অন্ধকারে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কপালকুণ্ডলা নাকি?" স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে তা জানিনা—আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।" (ব. র., পৃ. ১৫৩) কি সহজ, অথচ কতো সূক্ষ্ম রসিকতা! দস্যু হস্তে নিগৃহীতা দিল্লীশ্বরের অনুগৃহীতা মতিবিবির নির্ভীক নিশ্চঞ্চল হৃদয়ের বিদগ্ধ রস পরিবেশন আমাদের অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাস আশঙ্কাকে অনেকখানি তরল করে।

নবকুমারের সহযাত্রীরা গ্রামে ফিরে রটিয়ে দিলেন নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে। কারণ বিবেকের তাড়নায় গ্রামবাসীদের একটা অজুহাত দেখানো অত্যাবশ্যক ছিল। এখানে ভীরু আস্ফালনকারী বাঙালী সমাজকে নিয়ে ঔপন্যাসিক সহজ কৌতুক করেছেন,—"কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক"—কেহ বলিলেন, "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্ব্ব পরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পলাইতে পারিলনা।" (ব. র., পৃ. ১৫৮) বঙ্গবাসীর এ-হেন বীরত্ব আমরা আজও যত্র-তত্র দেখতে পাই।

পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী'। এ উপন্যাসে অতি দূরাগত ইতিহাসের ক্ষীণতম পদস্পন্দন শোনা যায় কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র-বিন্যাসের জন্যই এ অস্পষ্ট ধূম্রজাল রচনা। কাহিনী সবই কাল্পনিক, চরিত্রগুলিও বঙ্কিম-মানসজাত। এ-উপন্যাসে গিরিজায়ার গীতগুলি একান্তভাবেই উপভোগ্য, তবে সঙ্গে রঙ্গ-কৌতুকও বাদ যায়নি। যেমন:

কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি বলে দিলি ওই॥
সই ফিরে ক'না সই, ফিরে কনা সই
সই কথা কোস্‌ কথা কব, নইলে কারো নই॥ (ব. র., পৃ. ১৯৭)

এ-ধরনের সুর যুক্ত ছড়ায় কথা বলা সে-কালের সমাজে রসিকা অন্তঃ-পুরিকাদের একটি রীতি ছিল। ভৃত্য দিগ্বিজয় ও গিরিজায়ার কথোপকথন একান্ত ভাবেই উপভোগ্য। "গিরিজায়া, কে ও দিব্বিজয়?" দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, "আমার নাম দিগ্বিজয়।"

গি। ভাল দিগ্বিজয় আজি কোন্ দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ?

দি। তোমার দিক্।

গি। আমি কি একটা দিক্? তোমার দিগ্বিদিগ্জ্ঞান নাই?

দি। কেমন করিয়া থাকিবে—তুমি যে অন্ধকার। এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন, তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না।

দি। না, সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।"

(ব. র., পৃ. ১৯৮)

ভাব-গম্ভীর সহর্ষে পরিচালিত প্রণয় কাহিনীতে এ-দৃশ্য সংযোজন আমাদের মুক্ত বায়ু সেবনের আনন্দ দেয়, পারিজাত-সৌরভ বহন করে।

ঋষিকেশ মৃণালিনীকে আক্রমণ করলে গিরিজায়া তাকে দংশন করে। মৃণালিনী এ অপকর্মের কৈফিয়ৎ চেয়েছে। গিরিজায়ার উত্তর, "মিন্সে আমাকে একদিন 'কালা পিঁপড়ে' বলে ঠাট্টা করেছিল। সেদিন হুল ফুটানোটা বাকি ছিল। সুযোগ পেয়ে বামুনের ঋণ শোধ দিলাম।" (ব. র., পৃ. ২০৩)

"বধির ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মণী!" "ব্রাহ্মণী!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন," ব্রাহ্মণীর ওই বড় দোষ কাণে কম শোনেন।" বহু বার শোনা এ-রসিকতায়, নির্মল, সহজ, সরল, সকলের উপভোগ্য কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অন্যত্র গিরিজায়া ও রত্নময়ীর কথোপকথন :

"র। গায়ে জল দিব সই?

গি। জল সই? ভাল সই, তাও সই।

র। নহিলে ছাড়ি কই ?
গি। ছাড়িবে কেন সই ? তুমি যে আমার প্রাণের সই—তোমার মত আছে কই ? তুমি পারঘাটার রস মই—তোমায় না কইলে আর কারে কই ?
র। কথায় সই তুমি চিরজই ; আমি তোমার কাছে বোবা হই, আর মিলাইতে পারি কই ?
গি। আরও মিল চাই ?
র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।"
(ব. র. পৃ. ২২৩)

'মৃণালিনী' উপন্যাসে স্বরাজ্য উদ্ধার, হিন্দুরাজ্য স্থাপন, তুর্কী আক্রমণ, পশুপতির প্রণয়, উচ্চাশা এবং বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনাকারী নিবিষ্টচিত্ত স্রষ্টা নারী-অন্তরের সহজ সুখ-দুঃখ নিয়ে কি মধুর সংলাপই না সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাস শেষে পশুপতির মন্দিরে মনোরমা মালা গাঁথছেন। পশুপতি প্রেম-গদগদ কণ্ঠে মনোরমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন—"মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল—সে তাহা একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কর্ণে গেলনা। মার্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। —যতবার মনোরমা মালা তাহার গলায় দিতেছিল, ততবার সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল —মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধর দংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল—আর আবার মালা তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল।" (ব. র., পৃ. ২৪১) এ-অবশ্য নিছক হাস্যকর নয়। কৃষ্ণ মার্জারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক নরাধম পশুপতির তুলনা করা হয়েছে। মনোরমা আত্ম-পরিচয় জানে সুতরাং স্বামীর কণ্ঠে মাল্যদান অসঙ্গত নয়। এ শিল্প-চাতুর্য অনবদ্য !

রাজপুত্র হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মিলন অত্যাসন্ন। দিগ্বিজয় গিরিজায়াকে আশা করছে। এমন সময় গিরিজায়া তার কক্ষে প্রবেশ করল। তার ভালবাসা পরীক্ষার জন্য দিগ্বিজয় চোখ বুজে রইল। "অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্ দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া

বলিতে লাগিল, "আঃ মলো, ঘরগুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ— এ কি? এক মিন্সে! চোর নাকি? মলো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাত।" (ব. র., পৃ. ২৫১) এ-হয়ত বঙ্কিমের মানস-কল্পনাপ্রসূত পরিতৃপ্তি। তবে জানিনা প্রেমে পড়লে পুরুষ এমন ভেড়া হয় কিনা, মনুষ্য-চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ এবং গভীর অভিজ্ঞতা বলে, 'হয়'।

পরবর্তী উপন্যাসের পটভূমি আমাদের নিত্য-দিনের সংসার ও সমাজ-জীবন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সমাজ ইউরোপীয় রেনেসাঁর মৃদু তরঙ্গাঘাতে কম্পিত নয়, ঈষৎ আন্দোলিত ও স্পন্দিত; এখানে আমরা সেই সমাজ জীবনে প্রবেশ করছি। এ বিষবৃক্ষের শিক্ষিত ধনী-সমাজ, জমিদার বাড়ীর সদর অন্দরের কাহিনী। যে ধনী ব্যক্তির চিত্তের অনুশীলন হয়নি, যিনি না চাইতে সারা জীবন 'অপ্রাপণীয়' শব্দের সঙ্গে অপরিচিত সেই নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। অবশ্য এরা আমাদের সুদূরের প্রতিবেশী নন, অদূরের আত্মীয়।

প্রকৃতি ও পরিবেশ-বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তবর্ণ চিত্রকর। কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হ'ল গোবিন্দপুরের জমিদার বাড়ীতে। নানা বৈচিত্র্যের ভেতর গ্রাম্য নদীতীরের বর্ণনায় লেখক কৌতুকচ্ছলে বলেছেন, "ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পঁচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসীনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন।" (ব. র., পৃ. ২৬১) বাস্তব অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গ্রাম্যজীবন-চিত্র অঙ্কনে বঙ্কিম এখানে দীনবন্ধুর পরমাত্মীয়।

ব্রাহ্মধর্ম ও তার প্রগতিশীলতা নিয়ে দীনবন্ধুর বক্রোক্তি আমরা বিস্মৃত হইনি। এমন কি পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রও এ-পথের পথিক ছিলেন। সূর্যমুখীর পালিত ভ্রাতা স্বল্প-শিক্ষিত তারাচরণ গ্রাম্য-সমাজে শিক্ষক, দেবতুল্য। তারাচরণের গায়ে ব্রহ্মবাদের ঢেউ লেগেছে। তিনি "মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট-পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যোঠাইমার বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায়

পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" (ব. র., পৃ. ২৬৮) নিমচাঁদের স্বগোত্রীয়কে চিনতে আমাদের ভ্রম হয়না। কিন্তু এ-উক্তিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নেই, আছে নির্মম কৌতুক।

আমরা পূর্বে নদীঘাটের বর্ণনা পেয়েছি। আসুন একবার বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে জমিদার গৃহের অন্দরে প্রবেশ করি। সেখানে "কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া, মৎস্যজাতির সদ্যঃ প্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীর-গৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না। কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না।" (ব. র., পৃ. ২৭০) কি গভীর বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং তজ্জনিত রস আহরণ!

মধ্যযুগীয় কাব্যে আমরা অন্দরে জামাইয়ের রূপ-বর্ণনা ও এয়োদের সমালোচনা পেয়েছি। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন রমণীকুল সহজাত ভাবে স্বজাতির রূপে ঈর্ষাকাতর। অতএব ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীর রূপচর্চা করছেন অন্দরের রমণীরা—"প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা হৌক, কিন্তু নাকটা একটু চাঁপা।" তখন বামা বালিল, "রঙ্গটা বাপু বড় ফেঁকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল," চুলগুলো যেন শণের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল "কপালটা একটু উঁচু।" কমলা বলিল, "ঠোঁট দু'খানা পুরু।" হারাণী বলিল, "গড়নটা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল, "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" (ব. র., পৃ. ২৭৫) কৃষ্ণ-চরিত ব্যাখ্যাতা ঋষি বঙ্কিমের এ-এক বিস্ময়কর পরিচয়। দেবেন্দ্র পূর্বে ভাল মানুষ ছিল, স্ত্রীর দোষে তার পদস্খলন, চরিত্র ভ্রষ্টতা। সেই রমণীর বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক, "হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্ম-পরায়ণা।" (ব. র., পৃ. ২৭৬) হৈমবতীর চরিত্র-প্রতিষ্ঠায় আর অধিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে কি?

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'য় সহজ রসিকতার স্থান ছিল সীমিত। 'বিষবৃক্ষ' দৈনন্দিন গৃহ-জীবনের কাহিনী। তাই নিত্যকার জীবন-যাত্রার ছোট-খাট ভুল-ত্রুটি, রসালাপ, হাসি, ঠাট্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে পরম উৎসাহিত করেছে। শ্রীশ ও কমলমণির উপাখ্যান রঙ্গরসে ভরা। "কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং

করযোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ।" (ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।" (ব. র., পৃ. ২৮১) অন্যত্র "শ্রীশ-চন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিলেন। তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভালবাসি।" এই বলিয়া কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।"(ব. র., পৃ. ২৮১)

রাজলক্ষ্মীদেবী বঙ্কিমের দ্বিতীয় পক্ষ। তবে তাঁর জীবনে এই স্ত্রীর প্রভাবের কথা তিনি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারিনা।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৭৪) বঙ্কিম-উপন্যাসে আমরা বহু নিবিড় প্রেমাবদ্ধ দাম্পত্য-জীবনের পরিচয় পাই। সম্ভবতঃ তাঁদের মিলিত দাম্পত্য-জীবনই এর উৎস।

হীরার রূপ-বর্ণনায় প্রমত্ত দেবেন্দ্রর স্তব উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না :

"যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী মমগৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
(ব. র., পৃ. ২৯১)

এ-নিছক অন্দরবাসিনী স্ত্রী-সুলভ হাস্যরস নয়, পণ্ডিতের মুখ-নিঃসৃত প্রমত্ত পাণ্ডিত্য।

হীরার আয়ী চিকিৎসকের দ্বারস্থ হ'ল নাত্নীর চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার বললেন, "তোর নাত্নীর হিষ্টারিয়া হইয়াছে।" বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা ইষ্টিরসের ওষুধ নাই?" ডাক্তার বলিলেন "ঔষধ আছে বইকি। উহাকে খুব গরম রাখিস্ আর এই ক্যাষ্টর অয়েলটুকু লইয়া যা, কাল প্রাতে খাওয়াইস্, পরে অন্য ঔষধ দিব।" ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ওই রকম। বুড়ী ক্যাষ্টর অয়েলের শিশি হাতে লাঠি ঠক ঠক করিয়া চলিল। পথে একজন প্রতিবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরার আয়ী, তোমার হাতে ও কি? হীরার আয়ী কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাঁ গাঁ কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা হবেও বা, কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। তা তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা হীরার আয়ী তোর নাত্নীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরার আয়ী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "বয়স দোষে অমন হয়।" প্রতিবাসিনী, কহিল, "একটু কৈলে বাছুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি তাহাতে বড় রস পরিপাক হয়।" গ্রাম্যরমণীর রসিকতা স্থূল কিন্তু অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়।

বালক-বালিকাদের মুখে সে-কালের রীতি অনুযায়ী কিছু সরস ছড়া পরিবেশিত হয়েছে। আজও পল্লীগ্রামে বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে জ্বালাতন করবার জন্য তার দুর্বলতার উল্লেখ করে দল বেঁধে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছড়া কাটে। 'নীলদর্পণে'ও এ-ধরনের ছড়া আছে।

পরবর্তী উপন্যাস "ইন্দিরা"। এ-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে নায়িকা ইন্দিরার মতই প্রগল্ভ। একত্রে এতো রসের ভিয়ান তিনি আর কোনও রচনায় ছড়াননি। বিষয়বস্তু একান্তভাবেই তরল বা হালকা; ভাষা ও অলঙ্কার-প্রয়োগও তদনুরূপ।

ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ী প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—"আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন, হাল আইনে তাঁহাকে "আমার উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব।)" (ব. র., পৃ. ৩৪৩) এ-রীতি আজও সমাজে প্রচলিত তবে আধুনিকারা এখন নাম ধরেও ডাকেন না—'ডার্লিং', 'ডিয়ার' বলেই সম্বোধন করেন।

শ্বশুরবাড়ী কেমন এ-প্রশ্নের উত্তরে ইন্দিরা বলেছে, "জানি। সে নন্দন-বন। সেখানে রতি-পতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র ওঠে।" (ব. র., পৃ. ৩৪৩) পতি-বিরহকাতরা এক পূর্ণ যুবতীর মনের আশা-আকাংক্ষা, মিলন-ব্যাকুলতা ঔপন্যাসিক কতো স্বচ্ছন্দ কৌতুকরসে বর্ণনা করেছেন।

পথে পাল্কি রেখে বেহারারা বাতাস খাচ্ছে, জিরোচ্ছে। ইন্দিরার মন্তব্য, "ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামিসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্ ভরা যৌবনে!" (ব. র., পৃ. ৩৪৪) সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে ধনী কেমন করে দরিদ্রকে শোষণ করে বঙ্কিম সেই পরম সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন নিছক হাস্য-কৌতুকের অবতারণায়। কমলাকান্তের বিড়াল এখানেও ডেকে উঠলো "মেওঁ"।

দস্যুকর্তৃক পরিত্যক্তা ইন্দিরা নিদ্রাভঙ্গে দেখলেন, "আমার হাতে কিছু নাই, দস্যুরা প্রকোষ্ঠালঙ্কার সকল কাড়িয়া লইয়া বিধবা সাজাইয়াছে। বাঁ হাতে এক টুক্‌রা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিলাম।" (ব. র., পৃ. ৩৪৬) ইন্দিরা ভরা যুবতী পতিবিরহকাতরা স্বামীগৃহযাত্রিণী অভিসারিকা। স্বতঃই চিত্ত রঙ্গরসে ভরপুর। এতো ঘটনার পরও ডান হাত খালি রেখে স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় কাতর। যেমন 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেখেছি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা-রতা প্রফুল্ল লুকিয়ে একাদশীতে মাছ খেতো। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সামাজিক আচার সম্পর্কে ঔপন্যাসিক কতোখানি সচেতন তারই পরিচয় পাই। আগেই বলেছি ইন্দিরা সুচতুরা। কলিকাতায় তার এক খুড়া আছে, তার কাছে আশ্রয়ের আশায় এক কলিকাতাগামী পরিবারের সঙ্গ নিলো ইন্দিরা। কিন্তু খুড়ার ঠিকানা তার জানা নেই। উপরন্তু কলিকাতার লোক সমাগম দেখে ইন্দিরা হতবাক। সে চিন্তা করলো, "নদীসৈকতের বালুকারাশির ভিতর হইতে, চেনা বালুকা কণাটি খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে?" (ব. র., পৃ. ৩৫০) পরিশীলিত মানসিকতার চিন্তা-পদ্ধতিও কতো প্রাঞ্জল।

সুভাষিণীর শাশুড়ীকে বশ করে ইন্দিরার আশ্রয় জোটাতে হবে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই রসোচ্ছল। বয়স্কা ধনী গৃহিণীকে নিয়ে তাঁর কৌতুকের সীমা নেই—"তিনি (সুভাষিণীর শাশুড়ী) তখন ছাদের উপর অন্ধকারে, একটা পাটী পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছেন; একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল একটা লম্বা কালির বোতল, গলায় গলায় কালিভরা পাটীর উপর কাত্ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি বোতলটির টিনের ঢাকনির মত শোভা পাইতেছে, অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।" (ব. র., পৃ. ৩৫৩) ইন্দিরা উপন্যাসে দীনবন্ধু-বন্ধু বঙ্কিমকে তাঁর বড় কাছের লোক বলে মনে হয়। সুভাষিণীর শাশুড়ী স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান ছিলেন। এ-কারণে যুবতী ইন্দিরাকে স্বামীর সামনে যেতে দিতেন না। ইন্দিরার উক্তি, "আমি সময়ান্তরে লোকজনের কাছে সংবাদ লইয়াছিলাম কর্তা কেমন চরিত্র। সকলেই জানিত তিনি অতি ভদ্র-লোক—জিতেন্দ্রিয়। তবে কালির বোতলটার গলায় গলায় কালি।" (ব. র., পৃ. ৩৫৬)

সুভাষিণীর একটি শিশুপুত্র ছিল। সে ইন্দিরার সঙ্গে শাশুড়ী-সম্পর্ক পাতিয়ে ছিল। সেই সুবাদে সুভাষিণী খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কয়টি বিয়ে বেহান? কথাটা বুঝিলাম, বলিলাম, "কেন রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগে নাকি?

শুভা। ও ইয়াস্! বিবি পাণ্ডব ফাষ্ট কেলাস বাবর্চি ছিল। এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে ত?" (ব. র., পৃ. ৩৫৮) বুড়ী রাঁধুনীকে দেখে সুভাষিণীর মেয়ে হেমা ছড়া আরম্ভ করলো—

চলে বুড়ী, শোণের নুড়ী,
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি, গলায় দড়ি,
কাণে জোড়া দুল॥ (ব. র., পৃ. ৩৫৯)

কবি বঙ্কিম কোনও সুযোগই হেলায় হারাননি। পূর্বে মৃণালিনী উপন্যাসেও বঙ্কিম-রচিত বালক-মনোরঞ্জনতুল্য বহু ছড়া আমরা পেয়েছি।

ইন্দিরা বয়স্ক বামুন দিদিকে নিয়ে রঙ্তামাসা করতো। তাকে সুন্দরী যুবতী বানাবার জন্য ওষুধ ছলে গোপনে কলপ দিল। বৃদ্ধা রাতের

অন্ধকারে রূপচর্চা করতে গিয়ে সর্বাঙ্গে সেই কলপ মেখেছেন। সুতরাং "সকাল বেলায় যখন তিনি দর্শন দিলেন তখন চুলগুলা পাঁচরঙ্গা বিড়ালের লোমের মত কিছু শাদা, কিছু রাঙ্গা, কিছু কালো আর মুখখানি কতক মুখ পোড়া বানরের মত, কতক মেনি বিড়ালের মত।" (ব. র., পৃ. ৩৬০) এ-আনন্দমেলায় অংশ নিতে ছেলে বুড়ো কার না ইচ্ছে করে? এই দেখে সুভাষিণীর কন্যা শুরু করলো—

যম বলেছে, সোনার চাঁদ
এস আমার ঘরে
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।" (ব. র., পৃ. ৩৬১)

স্বামী মনিব বাড়ীতে অতিথি। ইন্দিরা বুঝলেন এই সুযোগ। কটাক্ষ-বাণে স্বামী বিদ্ধ হলেন। ইন্দিরার সংলাপ, "আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ করি নাই। তত পাপ এ হৃদয়ে ছিল না। তবে সাপও বুঝি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরেনা; ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলেই ফণা আপনিই ফাঁপিয়া ওঠে।" (ব. র., পৃ. ৩৬৪) বৃদ্ধা রাঁধুনীকে নিয়ে রসিকতার সঙ্গে এ দার্শ-নিকের সামঞ্জস্য বিস্ময়কর। ইন্দিরার যেন-তেন প্রকারে স্বামীকে বশ করতেই হবে। সুতরাং "তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র, আমি ইচ্ছা-পূর্বক—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্র বিস্তার স্বভাব-সিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয় "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।" স্বামীর দোহাই পেড়ে নীতিবাগীশ বঙ্কিম ইন্দিরাকে সকল প্রকার দৈহিক আকর্ষণীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দিলেন। এতো হাল্কা লজ্জাহীন ভাবে নারীর এ-জাতীয় আচরণ দেখলে মনে হয় "লবঙ্গলতাকে" কেন এ-শাস্তি প্রদান। সম্ভবতঃ পরপুরুষ বলে।

বঙ্কিম-মানস ক্ষীণতম হলেও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে। ইন্দিরা নিজের আচরণকে সমর্থন করে বলেছে, "আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিতেছি। আমি চিনিয়াছি যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য আমি যাহা করিতেছি তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ

নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন এমন কোনও মতেই সম্ভবে না।··· অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি। কিন্তু তিনি স্বামী আমি স্ত্রী—তাঁহাকে মন্দ ভাবা আমার অকর্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিব না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।" (ব. র., পৃ. ৩৬৯) বঙ্কিমের এ-খোঁড়া যুক্তি দেখে ভ্রমরের জন্য দুঃখ হয়। ইন্দিরা উপন্যাসের মত অশোভন প্রেম বা ভোগলালসা বঙ্কিমের রীতি-বিরুদ্ধ।

ইন্দিরা শুনেছে স্বামী তার প্রতি আসক্ত হয়েছে। সুতরাং যে ভাবেই হোক এঁকে বশীভূত করতেই হবে। অতএব, "মনে মনে কহিলাম যদি গণ্ডারের খড়্গ প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখ ব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে তবে আমার পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহা প্রয়োগ করিব।" (ব. র., পৃ. ৩৭২) শব্দ-শিল্পী বঙ্কিম এখানে সার্থক। তিনি বিশ্বাস করেন রমণীর কটাক্ষ তাঁর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আয়ুধ।

ইন্দিরা এবারে বঁড়শীতে মাছ গেঁথে খেলাচ্ছে। কারণ তাকে গ্রহণ করবার শর্ত স্বামীর কাছ থেকে আদায় করতে হবে। অতএব স্বামী হলেও সহজে দেহদান উচিত হবে না—"আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। জৈষ্ঠ্য মাসের অসহ্য সন্তাপে, দারুণ তৃষাপীড়িত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয় তীরে বসাইয়া দিয়া মুখ বাঁধিয়া দাও, যেন সে জলপান করিতে না পারে—বল দেখি তার জলে ভালবাসা বাড়িবে কিনা?" (ব. র., পৃ. ৩৭৩) একে কে বলে অবলা? হাকিম বঙ্কিম ইন্দিরার মুখে রঙ্গচ্ছলে আইনবিদের যুক্তি তুলে ধরেছেন।

পুরুষ বশ করতে হয় নারীকে; কারণ পুরুষের স্বভাব দোষ—"যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, রাখাল গরুকে পাঁচন বাড়ির দ্বারা বশ করে, কোচমান ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনই হাসি চাহনিতে তোমাদের বশ করি। আমাদের পতিভক্তি আমাদের গুণ। আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ।"

এখানে বঙ্কিম পদাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামী-প্রেমের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমের তুলনা করেছেন। এ একেবারে অতি আধুনিকার যুক্তি।

'ইন্দিরা' বঙ্কিমের এক পৃথক সৃষ্টি। বঙ্কিম দার্শনিক, আদর্শবাদী কিন্তু পাপিষ্ঠা রোহিণীও নিজেকে এতো সহজলভ্য করতে পারেনি। সে তার হীরালালের প্রতি আচরণ থেকেই বোঝা যায়। এমন কি ইন্দিরা বলেছে, "পরিণামে যদি তিনি আমার পরিচয় পাইয়াও যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, গণিকার মতও যদি তাঁহার কাছে থাকিতে হয় তাহাও থাকিব। স্বামীকে পাইলে লোকলজ্জাকেও ভয় করিব না।" (ব. র., পৃ. ৩৭৪) ইনি পরবর্তী কালের অন্নদাদিদির পথিকৃৎ। কামিনী ছড়া কেটেছে :

"ধবলী বলিল শ্যাম! কে চেনে তোমারে,
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে।
পদ চিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কাণে,
ধ্বজাবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি তা জানে? (ব. র., পৃ. ৩৮২)

ভেড়াকান্ত ভগ্নিপতির প্রতি শ্যালিকার এ-সম্ভাষণ সত্যিই মধুর রসোদ্দীপক। শ্যালিকার কথা শুনে উপেন্দ্র বলেছেন, "বলুক গে, ছেলেমানুষ, অমৃতং বালভাষিতং"। কামিনী! তুমি যখন বিদ্যাধরী শাসিতং তখন তোমার বুদ্ধি নাশিতং। আমি তবে আসিতং; মা ডাকিতং।··· এখন দুই দিন এখানে থাকিতং খাবিতং দাবিতং হাসিতং খুশীতং খেলিতং ধূলিতং হেলিতং দুলিতং নাচিতং গায়িতং।" (ব. র., পৃ. ৩৮৩) বঙ্কিম শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন এবং আমাদেরও নাচিয়েছেন।

নতুন জামাই শ্বশুর বাড়ীতে এলে অন্দরে রমণীকুলের বড় আসর বসে। মঙ্গলকাব্যেও আমরা এ-দৃশ্য দেখেছি। এখানে রস-রসিকতা প্রায়ই ভাঁড়ামি পর্যায়ে যায়। বঙ্কিমও দূরে থাকেননি। পুরনারীরা বিভিন্ন ভাবে বিশেষতঃ কারও চারিত্রিক দুর্বলতা অবলম্বনে কৌতুক করেছেন। বঙ্কিম এখানে একেবারে পল্লীসমাজের অন্দরের অধিবাসী। সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ-বর্ণনা এসেছে।

এই হাসি-কৌতুক-আনন্দের ভেতর দিয়ে ইন্দিরা তার চির ইপ্সিত, আকাংক্ষিত পতিগৃহে যাত্রা করেছে। 'ইন্দিরা' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ খুব সহজ মন-মানসিকতা ও একটি আনন্দঘন পরিবেশে ছিলেন।

ইন্দিরার মত এমন লঘু চরিত্রের নারী বঙ্কিম-উপন্যাসে বিরল। মতিবিবিও নবকুমারকে চেয়েছে, কিন্তু এ-ভাবে নয়। সর্বাধিক রস-কৌতুক হাসি-ঠাট্টা এ-উপন্যাসেই পরিবেশিত হয়েছে। ভাল হোক, মন্দ হোক 'ইন্দিরা' বঙ্কিম-চন্দ্রের একখানা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপন্যাস।

'যুগলাঙ্গুরীয়' রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস। বলা চলে রূপকথার রাজ্য এর পটভূমি। নায়ক পুরন্দর ও নায়িকা হিরন্ময়ীর প্রেম, বিরহ ও মিলন এর উপজীব্য বিষয়। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্তব চরিত্রই নেই; এ-কারণে সরস রঙ্গ-কৌতুক বা ব্যঙ্গের অবতারণার সুযোগও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর'। এ-উপন্যাসে বঙ্কিম আদর্শ-পূজারী। ইন্দিরার জন্য এতো প্রশ্রয় কিন্তু শৈবলিনীকে তার বাল্য-প্রণয়ের অভিশাপে জর্জরিত করা হয়েছে। রূপসী শৈবলিনী বিয়ের পর গুরু পেয়েছে কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহ-সম্পন্ন স্বামী পায়নি। পেলে হয়ত বাল্য প্রণয়ীকে সে ভুলে যেতো। জীবনের ওপর তার কোনও আকর্ষণ ছিলনা, দায়-দায়িত্ব বোধও ছিলনা। তাই চরম ঔদাসীন্য হেতু লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করেছে—"ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া, জলের নিকটে আসিয়া বলিল, "I come again fair lady." শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না, "oh-ay that nasty gibberish —I must speak it I suppose. হাম্ again আয়া হ্যায়!"

শৈব। কেন?

যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিস্ বোলতা হ্যায়?"

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম! John you mean? হম্ জন্ নহি, হম্ লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজী কথা শিখিলাম। লরেন্স অর্থে বাঁদর।"

(ব. র., পৃ. ৪০৬) অপরিণত বুদ্ধি-সম্পন্ন তরুণীর নিছক হাস্য-কৌতুক।

লরেন্স ফষ্টরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন; "এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে একার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই

ভাল, এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে। অতএব অকর্তব্য।" (ব. র., পৃ. ৪০৭) দলনী বেগম যুদ্ধের সম্ভাবনার সংবাদে একান্ত ভাবেই বিচলিত। তিনি মীর কাশিমের প্রণয়িনী, তাঁর স্ত্রী, তাঁর শুভাকাংক্ষী। গুরগণ খাঁ যুদ্ধ চায়। সুতরাং তার কাছ থেকে যুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ জানতে হবে, অতএব দাসী কুলসুমকে একান্তে পাঠাতে চান—

"দলনী কহিলেন, কুলসুম তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস?
কু। কি? ইলিশ মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?"
(ব. র., পৃ. ৪১৩)

নিরাশ্রয় দলনী ও কুলসুম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রতাপের গৃহে নীত হলেন। ভৃত্য রামচরণ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দুইজন সুন্দরী যুবতীকে দেখে ভাবলো, "বোধ হয় এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।" (ব. র., পৃ. ৪০৭) শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী সম্পর্কে ভৃত্যের ধারণা কি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রতাপের গৃহ আক্রমণের জন্য গলষ্টন ও জনসন নামক দুই ইংরেজ আমিয়ট কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে। বাড়ীর কাছে এসে গলষ্টন জনসনকে বল্লেন, "তবে বাতি ও দেশলাই লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না-খরচ হইবে।" (ব. র., পৃ. ৪২৫) ধনী ইংরাজের দৃষ্টিতে ভারতবাসী কি কৃপার পাত্র!

রামচরণ আহত হয়ে বন্দী হয়েছে। অবশ্য ইংরেজ আমিয়ট তাকে মুক্তি দিয়েছে। মুক্তির সংবাদ শুনে রামচরণ বলেছে, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানিনা, রাগ করিবেন না। আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন "কেশ?"
রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?
আমিয়ট। কি তামাসা!

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায় বুঝায় যে আমি আপনাদের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার

ছেলে ইংরেজের ভগ্নী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।" গমন কালে রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিল মিণ্ডিলের পিতৃ-মাতৃ-ভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। (ব. র., পৃ. ৪৩৯) কথিত আছে হিন্দু সমাজে নাপিত ও গোয়ালা অতি চতুর। গোয়ালা রাইচরণকে নিয়ে বঙ্কিমের গ্রাম্য রসিকতায় আপত্তি নেই।

পাগলিনী শৈবলিনী ছড়া বলছেন:

"স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে;
তে কাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে? (ব. র., পৃ. ৪৫০)

বন্দী ফষ্টর ঈশ্বরকে ডাকছেন। লেখকের মন্তব্য, "কেহ বিস্মিত হইও না, যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে, ভক্তি-ভাবে ডাকে, ফষ্টরও ডাকিল।" (ব. র., পৃ. ৪৭২)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাব-গম্ভীর। বাল্য-প্রণয়ের অভিসম্পাত, বিবাহিতা নারীর পূর্ব প্রণয়-সম্বন্ধ ইত্যাদি ভিত্তি করে দীর্ঘ উপদেশাবলী বর্ষিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর ও তাঁর গুরুদেবের ভাষ্য এ উপ-ন্যাসকে শাস্ত্রীয় গুরুভারে ভারাক্রান্ত করেছে। তাই বঙ্কিম এখানে তত্ত্বদর্শী শিক্ষক; রঙ্গ-রসিকতা থেকে অনেক দূরে তাঁর অবস্থান।

'রাধারাণী'ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র ন্যায় গল্প-কাহিনী। অবাস্তব এক ঐশ্ব-রিক প্রেম লালন করেছে রাধারাণী। এ-বয়সে প্রেমের আদর্শ কি শরৎচন্দ্র এখান থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, যার জন্য আট বছরের পার্বতীর বিরহ-জ্বালা আমরা জানতে পারি। যাই হোক, ক্ষেত্র বিশেষে বাল্য-প্রণয়ে অভি-সম্পাত থাকলেও রাধারাণীর ক্ষেত্রে বঙ্কিম তাকে সৌভাগ্যবতী করেছেন। এ-কাহিনীতে রঙ্গ-কৌতুকের সুযোগ হয়ত ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধিতে স্রষ্টা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না।

রাধারাণী রুক্মিনীকুমারের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন নেই। বিবাহের প্রস্তাব কে উত্থাপন করবে? এ-প্রসঙ্গে রাধারাণীর বক্তব্য, "ওঁতে আমাতেই সে কথাটা হবে কি? ক্ষতি কি? ইংরেজ মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন কাজটাই করি। এই যে উনিশ বৎসর

বয়স পর্যন্ত আমি বিয়ে করলেম না, এতে কে না কি বলে? আমি তো বুড়ো বয়স পর্যন্ত কুমারী—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।" (ব. র., পৃ. ৪৮৭) বঙ্কিমচন্দ্র চতুর আইনজীবীর মত এখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন।

পরবর্তী উপন্যাস 'রজনী'। 'রজনী' প্রণয়োপন্যাস হলেও এর চরিত্র-স্বষ্টিতের বঙ্কিম নিজস্ব আদর্শ প্রচার বা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। লবঙ্গলতাই এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং রক্ষণশীল বঙ্কিমের আত্মজা। রজনী চরিত্রে উত্থান-পতন নেই। দয়িতের প্রেমকে মূলধন করে রজনী এগিয়ে গেছে তার সাধ্বী জীবনের পথে। লবঙ্গলতা ভাল বেসেছিল একজনকে, যে তার বালিকা মন ছুঁয়ে ছিল। কিন্তু যুবক প্রেমিক কামাসক্ত হওয়ায় তাকে কঠিন শাস্তি দিল লবঙ্গলতা। বৃদ্ধ স্বামীকে প্রেম-ভালবাসা, সেবা-যত্ন, সপত্নী-সন্তানকে লালন ইত্যাদির মাঝে নিজ জীবনের সার্থকতা লাভ করতে সে চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছিল কি? এখানেই বঙ্কিম 'হৃদয়' ও 'বাহিরের' ব্যবধান স্বষ্টি করে সমাজ ও ধর্মের জয়গান গেয়েছেন। স্বামী লবঙ্গলতার আরাধ্য দেবতা এ-কথা সত্য, কিন্তু অমরনাথের স্মৃতিকে কি ঔপন্যাসিক তার মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছিলেন? রজনীকে বিয়েতে রাজী করাতে গিয়ে লবঙ্গলতার স্বগতোক্তি—'কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস! তুমি লবঙ্গলতা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" প্রকাশ্যে বলিলাম, "না, রজনী, আমার বুড়া স্বামী—আমি অত শত জানিনা।" (ব. র., পৃ. ৫২৭) সতর্ক বিচারক বঙ্কিম নিজের অলক্ষ্যে লবঙ্গলতাকে এক কমনীয় নারীতে রূপান্তরিত করেছেন। শিল্পী ধন্য!

চরিত্র-বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করি। রজনী আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, "বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিলনা। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার। অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গেনা, গলায় চেন—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্টমহিষী।" (ব. র., পৃ. ৪৯১) ঐতিহাসিক বিচারে মনুমেণ্ট আজ মসীলিপ্ত কিন্তু বঙ্কিমের কালে মনুমেণ্টের ঔদ্ধত্য ছিল, কদরও ছিল। এ রঙ্গ-তামাসার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়?

রজনী বড় বাড়ীতে ফুল যোগান দিত। আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছে, "সে কালের মালিনী মাসী রাজবাটীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেননা, সে রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।" (ব. র., পৃ. ৪৯২) 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা'র মতই মুখর। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই নায়িকা কুমারী এবং প্রাপ্ত বয়স্কা। এ-উপন্যাসের যত্র-তত্র রস-রসিকতার ছড়াছড়ি, তবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতও কম নেই।

স্বামীর বয়স ৬৩, লবঙ্গলতার ১৯। বর্ণনায় পাই, "দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরে আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী, তিনি রামসদয়ের সিন্ধুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূর্ণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরের কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।" (ব. র., পৃ. ৪৯২) বঙ্কিমচন্দ্রের স্বগৃহে দ্বিতীয় পক্ষ ছিল; সুতরাং তার আদর তিনি জানতেন।

লবঙ্গলতা নানা ভাবে রামসদয়কে সাজাত, "সাজাইয়া বলিত—"দেখ রতিপতি।" রামসদয় বলিত, "দেখ দেখ সাক্ষাৎ অঞ্জনানন্দন।" (ব. র., পৃ. ৪৯৩) চাঁপার ভাই হীরালাল রজনীর পাণি-প্রার্থী। সে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, "আমি যখন স্তশ্চুভিশ্চশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল।"(ব. র., পৃ. ৪৯৯) বঙ্কিম এ-ধরনের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পত্র-পত্রিকার আরও সমালোচনা করেছেন। এঁরা পরোপকার-মানসে উপদেশবাণী বর্ষণ করে থাকেন। "আর এক প্রকারের লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয়, "বকাবকি লেখালিখি"। সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রেজলিউশন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন—আমি তাহাতে নাই। আমি একবার কোন বন্ধুকে একটি মহা-সভার ঐরূপ একখানা আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পড়িতেছ? তিনি বলিলেন, "এমন কিছু নয়, কেবল কানা ফকির ভিখ্ মাঙ্গে।" "এ-সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই—কেবল "কানা ফকির ভিখ্ মাঙ্গে।" (ব. র., পৃ. ৫০৭) অবশ্য এ নিছক রঙ্গ-কৌতুক নয়,

এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হুল আছে। বঙ্কিম এ-উক্তি করেছেন অমরনাথের জবানীতে। এখানেই ক্ষান্ত হননি। নিজের মনের কথা বলার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন—"এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর। অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক।" (ব. র., পৃ. ৫০৮) অবশ্য এ-রসিকতা নয়, ব্যক্তি বঙ্কিম এ-সকল সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। এ-কারণেই কুন্দর আত্মহত্যা, রোহিণীর অকাল-নিধন।

বিবাহকালে আমাদের পাত্র কেমন পাত্রী কামনা করেন? শচীন্দ্রের মুখেই শুনুন, "বংশ মর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহ্লররাও হুল্‌কারের প্রপৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময় পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময় হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময় মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কিনা, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্র-মধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে...।" (ব. র., পৃ. ৫১৪) শতবর্ষের অধিককাল অতীত হয়েছে তবু আজও সকল বিবাহযোগ্য পাত্রের কামনায় শচীন্দ্রের সঙ্গে সামান্যই ব্যবধান। এর সঙ্গে যুক্ত হবে পাত্রীর পিতৃদত্ত যৌতুক।

শচীন্দ্রকে লবঙ্গলতা রজনীকে বিয়ে করবার জন্য অনুরোধ, উপরোধ থেকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেছে। শচীন্দ্র রাজী নয়। "ছোট মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই বলনা কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবেনা।" ছোট মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।" ছোট মা বড় দুষ্ট। আমাকেই বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন। (ব. র., পৃ. ৫১৯) এখানে বঙ্কিম হাল্‌কা মেজাজে সহজতর রসিকতায় উৎসাহী।

রজনীর সঙ্গে সপত্নী-পুত্রের বিবাহের জন্য রজনীর পালয়িত্রী মাতার সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন লবঙ্গলতা। তার মতামত জিজ্ঞেস করায় মালী বৌ বললো, "কি করিব মা, আমি মেয়ে মানুষ, অত কি জানি?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল—আমি বলিলাম, "সে কি মালী বৌ? মেয়ে মানুষে জানেনা ত কি পুরুষ মানুষে জানে? পুরুষ মানুষ আবার সংসার ধর্ম্ম কুটুম্ব, কুটুম্বিতার কি জানে? পুরুষ মানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে এই পর্যন্ত—পুরুষ মানুষ আবার কর্ত্তা নাকি?" (ব. র., পৃ. ৫২৩)

নাইরোবি বিশ্বনারী সম্মেলনে আমরা এ-উক্তির জন্য লবঙ্গলতাকে পেলে ধন্য হ'তাম। 'রজনী'তে এক ঝলক শীতল মলয় বায়ু আমাদের প্রশান্তি দান করে।

বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাস বহুল আলোচিত, বহুল প্রশংসিত এবং সমালোচিত "কৃষ্ণকান্তের উইল"। অনেক সমালোচক এ-উপন্যাসকে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম এবং রোহিণীকে বাংলা উপন্যাসের প্রথম প্রাণ-চঞ্চল বাস্তব নায়িকা-চরিত্র রূপে আখ্যায়িত করেছেন। রোহিণীকে নিয়ে শরৎ-চন্দ্র পর্যন্ত বঙ্কিমকে আক্রমণ করেছেন। কেন এই নিরপরাধ রমণীকে গুলি করে হত্যা করা হ'ল—কি অপরাধে এবং কার পাপে? আমাদের আলোচনা সে-প্রসঙ্গে নয়, এ-কারণে প্রসঙ্গান্তরে যাচিছ। রোহিণীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্রষ্টা বলেছেন, "আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনায়—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই।" (ব. র., পৃ. ৫৪৩) অবশ্য তাই বলে বঙ্কিম নিরস্ত হননি; আর সে-বর্ণনায় রঙ্গ-কৌতুক আছে বলে উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—"রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পড়িত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। (ব. র., পৃ. ৫৪৩) বঙ্কিম প্রচুর পরিমাণে পরের গুণ গেয়ে ফেলেছেন!

হরলাল ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে জাল উইল লিখবার জন্য হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করলো। কাজটি সহজ নয়, বেঈমানী ও বে-আইনী ; তবুও জেলখানার ভয় আছে ; ব্রহ্মানন্দ রাজী হ'ল। কারণ—"হরলালের এ টাকা হজম করা ভার—কিন্তু ত্যাগ করাও যায়না। লোভ বড় কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।" (ব. র., পৃ. ৫৪২) দরিদ্র ব্রাহ্মণের দান গ্রহণে লজ্জা নেই, তাই সময়ে ঠকিয়ে নিতেও সঙ্কোচ নেই।

উইল চুরির কাজ সিদ্ধ হলে হরলাল রোহিণীকে চোর অপবাদ দিয়ে বিয়েতে অসম্মত হ'ল। হতাশায় জর্জরিত ক্ষুব্ধ রোহিণী বললো, "তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়ে ঘর ঝাঁট দিই তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ মানে মানে দূর হও... রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল।" (ব. র., পৃ. ৫৪৭) রোহিণী ব্রহ্মানন্দের জ্ঞাতি কন্যা, দাসী নয়। চাকরাণী সম্পর্কে ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন, "যাহার চাকরাণী নাই তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামের দেবতা এই চারিটির স্থষ্টিকর্তা। বিশেষ যাহার অনেক-গুলি চাকরাণী তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ।" (ব. র., পৃ. ৫৪৭) এ কৌতুকের নির্মম বাস্তবতা আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছি।

রোহিণীর সামাজিক আচরণ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন, "রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে।...হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল। এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।" (ব. র., পৃ. ৫৪৮) পরবর্তী কালে রোহিণীর আচার-আচরণ পরিবেশনের জন্য এ উপক্রমণিকা।

রোহিণী গোবিন্দলালকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। তাই কলসী কাঁখে বারুণী পুকুর থেকে ফিরছেন—"কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢন্—উপায় আমি, দড়ি সহযোগে।" (ব. র., পৃ. ৫৫০) গোবিন্দলাল উদ্যান থেকে হাওয়া খেয়ে

এসেছেন। বালিকাবধূ ভ্রমর অনুযোগ করেছে ঘরে বাইরে খাই খাই কেন? "কেন এইমাত্র আমার গালি খাইয়াছ।" গোবিন্দলাল: "জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে এ দেশের লোক এতদিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।" (ব. র., পৃ. ৫৫৪)

গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাহায্য করতে এসেছেন। চুরির দায়ে ধৃত রোহিণী, গোবিন্দলাল জেরা করবার জন্য তাকে অন্দরে পাঠাতে খুল্লতাতকে অনুরোধ করলেন। "কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু করবে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত"। বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগদীকে বলিলেন, "ওরে! একসঙ্গে করিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস, যেন পালায় না।" নগদী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?" (ব. র., পৃ. ৫৫৭) কৃষ্ণকান্তের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে গোবিন্দলালের চপলতা সত্যই ধরা পড়েছিল। তাই অভিভাবকের সতর্কতা; কিন্তু পরিবেশনার কি সরস ভঙ্গী!

কৃষ্ণকান্ত অহিফেন সেবন করে দিবানিদ্রাগত। গোবিন্দলাল তাঁর কাছে দরকারে এসেছেন। কৃষ্ণকান্তের অবস্থা, "এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদ সুরে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয়? —নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন?" (ব. র., পৃ. ৫৬১) গোবিন্দলালের অন্তরে সংশয়, দ্বন্দ্ব, সংঘাত। রোহিণীর প্রতি আসক্তি অন্যায় এ-সত্য জেনেও নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারছেন না। রোহিণী-প্রসঙ্গে তিনি ভ্রমরকে বল্লেন, "বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।" (ব. র., পৃ. ৫৬২) কৃষ্ণকান্তের কথাই সত্য, এ-কালের ছেলেগুলোর হলো কি ?

রোহিণী বারুণী পুকুরে ডুবলো কিন্তু মরলো না। গোবিন্দলাল তাকে উদ্ধার করলেন। তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনবার জন্য বাগানের উড়িয়া মালিকে বল্লেন—"আমি ইহার হাত দুইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁদে দেখি!" মুখে ফুঁ! সর্বনাশ! ওই রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফুঁ—"সে হৈ পারিব না মুনিমা!" মালীকে মুনিব যদি শালগ্রাম শিলা চর্ব্বন করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কট্‌কি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, "মুসে পারিবি না অধবড়।" (ব. র., পৃ. ৫৬৫) এ-রসিকতা বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, বাঙ্গালী সমাজে এক কিম্বদন্তীর মত রসোচ্ছলে ঘরে ঘরে উচচারিত হ'তো।

দাস-দাসী মহলে স্বভাবতঃই রোহিণী ও গোবিন্দলালকে নিয়ে নানা কুৎসা রটনা চললো, "কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি—হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকন্ঠা কুলকামিনীগণ! তাহা আমি অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহিনা।" (ব. র., পৃ. ৫৬৯) এক ঢিলে দু'পাখীই মরলো, কলঙ্ক রটনাকারী স্ত্রী লোকের স্বভাব জানানো হ'ল আর সত্যবাদী পুরুষের জয়ধ্বজা উড়লো।

ভ্রমর তার অল্প বিদ্যা ও সীমিত জ্ঞান নিয়ে নিরুপায় হয়ে গোবিন্দ-লালকে চিঠি লিখতে বসেছে। সেকালের এমন বহু বহু চিঠি বিদ্বান যুবক তার বালিকা-বধূর কাছ থেকে পেতেন। ভ্রমর লিখছে, "সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তারপর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) "দাস্যা" (আগে দাস্মা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামাঃ ('প্র' লিখিতে প্রথমে 'স্র' তারপর 'শ্র', শেষে 'প্র') 'নিবেদনঞ্চ' (প্রথম নিবেদঞ্চ, তারপর নিবেদনঞ্চ) "বিশেষ" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই।" (ব. র., পৃ. ৫৭১) ভ্রমরের জীবনের চরম এক সঙ্কটময় মুহূর্তে স্রষ্টা এই ক্ষুদ্র বালিকার প্রেমপত্রে রস সিঞ্চন

করে আমাদের কিছুটা দুঃসহ যাতনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। শুনেছি আমার এক কাকীমা নাকি তাঁর স্বামী অর্থাৎ আমার কাকাকে চিঠিতে সম্বোধন করেছিলেন, "পানের পান" অর্থাৎ "প্রাণের প্রাণ"। আমরা বড় হয়েও এ-নিয়ে আমার কাকাকে তাঁর পেছনে লাগতে দেখেছি। আজকাল নাকি মেয়েরা প্রেমপত্রে ইচ্ছে করে বানান ভুল লেখে, না হলে প্রণয়ী তাকে অতি বিদূষী জানলে প্রত্যাখ্যানের ভয় আছে।

এরপরের কাহিনী বড় করুণ—"গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।" (ব. র., পৃ. ৫৭৪) এখানে রসিকতা নেই, আছে অন্তর-বেদনা।

কন্যা ভ্রমরের অন্তিম সময় উপস্থিত। সে স্বামীকে একবার দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। পিতা মাধবীনাথ সন্ধানে চল্লেন। প্রথম গেলেন গ্রাম্য পোষ্ট অফিসে—"পোষ্ট মাষ্টারবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি।" (ব. র., পৃ. ৫৮৫) বঙ্গাল নিয়ে রসিকতা দীনবন্ধুও প্রচুর করেছেন। তাঁর রামমাণিক্য ক্লাসিক চরিত্র। বঙ্কিমও একটি সূক্ষ্ম খোঁচা দিলেন। এরপর একটিবার মাত্র এ-উপন্যাসে বঙ্কিমকে অসতর্ক হতে দেখি, "রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল—"এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়—গোবিন্দলালের রঙ্ ফরশা। কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।" (ব. র., পৃ. ৫৮৯) রঙ্গরস শুধু নয়, রোহিণী নিধনের জন্য এ-ভূমিকার আবশ্যক ছিল। পর-পুরুষের রূপে মুগ্ধ, তার সঙ্গ-কামনা করছে আর মুখে উচচারিত হচ্ছে" আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।" এই সূত্রেই রোহিণী-চরিত্রের ট্র্যাজেডী।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র এবং মোগল-রাজপুত সম্পর্কের পরিবেশ সৃষ্টিতে এর পটভূমিকা ইতিহাস-আশ্রিত।

তবে নিঃসন্দেহে কাহিনী বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত। রূপনগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক বলেছেন, "কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রম সিংহ।" (ব. র., পৃ. ৬০৭)। এখানে ব্যঙ্গার্থেই বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে।

তস্‌বীরওয়ালীকে ঘিরে চঞ্চলকুমারীর সখীরা রঙ্গরসে ব্যস্ত। একখানা ছবি তুলে জনৈকা সহচরী জিজ্ঞেস করলো, "এ কাহার তস্‌বির আয়ি?" প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজাঁদা বাদশাহের তস্‌বির।" যুবতী বলিল. "দূর মাগী, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি।" (ব. র., পৃ. ৬০৭)

বাদশাজাদীর চরিত্র-চিত্রণ করছেন ঔপন্যাসিক। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে আলাপ করছে—
"মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"
জেবউন্নিসা। আল্লা, এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য আমি। কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব। আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।" (ব. র., পৃ. ৬১৮) বাদশাজাদীব সীমাহীন দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য দেখাবার জন্যই এ-কৌতুককর উক্তি।

রাজসিংহের কাহিনীতে আছে ঔরঙ্গজেব দারার বিধবা-পত্নীর পাণি-গ্রহণ করেছিলেন। উড়িয়া-সমাজে ভ্রাতৃবধূ বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে—"এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কর?" সে ঝটিতি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব?" (ব. র., পৃ. ৬২২)

মবারককে চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাবার প্রস্তাব দিচ্ছে জেবউন্নিসা, "মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব?"
জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাসা; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।
মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই?
জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা!

সবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?
জেব। সুখের জন্য! ভালবাসা দুঃখ মাত্র।" (ব. র., পৃ. ৬২৬-২৭) দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞ বঙ্কিম রসিকতা করতে গিয়েও গূঢ় দর্শন-চর্চা করেছেন।

মিশ্র ঠাকুর চঞ্চলকুমারীর দৌত্য-কর্ম করে। গৃহিণীর জিজ্ঞাসা, "কেন যাইবে?' মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না।'' (ব. র., পৃ. ৬৩১) নারীর অর্থলোলুপতা প্রচার নিয়ে এ-কৌতুক।

মাণিকলালের তিনকুলে কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই, "কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাত-পুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।"(ব. র., পৃ. ৬৪০) গরজ বড় বালাই নতুবা এমন গবেষণা করে পিসিকে খুঁজে বের করতে হয়?

দিল্লীর পানের দোকানের বর্ণনায়—"দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজমোড়া —নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কানো—তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় 'obscene' প্রাচীন ভাষায় 'আদিরসাশ্রিত।" (ব. র., পৃ. ৬৪৩) পানের দোকানের ছবিকে স্বভাবতঃই আকর্ষণীয় হতে হয় আর এতো খাস দিল্লীর পানওয়ালীর দোকান। নির্মলকুমারী ও মাণিক-লালের সাক্ষাৎ হ'ল। পথ-শ্রান্ত নির্মলকুমারীকে তুলে নিয়ে মাণিকলাল বিয়ের প্রস্তাব দিল। লেখকের মন্তব্য—"বোধ হয়, কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটিও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—" হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিক!" সে-সব কিছুই নাই—ধিক।" (ব. র., পৃ. ৬৫৫) বঙ্কিম কোর্ট-শিপের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু "আই লাভ ইউ" উচ্চারণের সুযোগ দিলেন না। এখানে বঙ্কিম বড় নির্মম!

রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বল্লেন, "তোমার মত কেহই সুরূপা নহে।" চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।" (ব. র., পৃ. ৬৬০) যুবতী কন্যা প্রণয়াস্পদকে পেয়ে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা হয়েছেন।

নির্মলকুমারী রহস্যচ্ছলে যোধপুরী বেগমকে বলেছে :

"সোনে কি পিঁজিরা, সোনে কি চিড়িয়া,
সোনেকি জিঞ্জির পয়ের মে
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কঁও সেরেফ্ যয়ের মে।" (ব. র., পৃ. ৬৭৭)

শুধু রঙ্গ কৌতুক নয়, কবি বঙ্কিমের রচনা-চাতুর্য লক্ষণীয়। পরবর্তীতে দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র নাটকে-প্রহসনে এ-ধরনের গীত পরিবেশন করেছেন। এখানে ধনীর অন্তঃপুরিকাদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন বঙ্কিম। "কতকগুলি লোক আছে, এ-দেশের লোকেরা তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা বা ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন।" (ব. র., পৃ. ৬৭৭) রসভোগ্য তুলনা।

উপসংহারে 'নিবেদন' সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের প্রতি বঙ্কিমের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা কোন কোন জায়গায় কৌতুকরস ব্যাহত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস বহুল সমালোচিত 'আনন্দমঠ'। হিন্দু রাজ্য স্থাপন, যবন নিধন এবং ইংরেজকে স্বাগত আহ্বানের ভেতর দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই এখানে বঙ্কিমের দৃষ্টি অস্বচ্ছ ও একদেশদর্শী; নতুবা বঙ্কিমকে অসংযত বলবার বিন্দু মাত্র সুযোগ তিনি আমাদের কোথায়ও দেননি। কিন্তু আনন্দমঠে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মুখে বার বার "নেড়ে" শব্দটি হাস্যরস পরিবেশনেই শুধু ব্যর্থ নয়, শ্রুতিকটুও শোনায়। অবশ্য এ-সকল আদর্শগত তত্ত্ব-বিচার এ-নিবন্ধের বিষয় বহির্ভূত।

আনন্দমঠের বিষয়বস্তু এতোই গুরু-গম্ভীর যে এখানে রঙ্গ-কৌতুকের অবকাশ প্রায় নেই বল্লেই চলে। ঔপন্যাসিক দুর্ভিক্ষের পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, "১১৭৫ সালে বর্ষা কালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল,

কৃষক-পত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্যে স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। (ব. র., পৃ. ৭১৬) নারীর অলঙ্কার-প্রিয়তা নিয়ে আবার কৌতুক!

সন্তানেরা ধনীর অর্থ-সম্পদ লুট-পাট করে এনে দেবীর ভাণ্ডার পূর্ণ করে। এ-দস্যুবৃত্তির সমর্থনে ভবানন্দ বলেছে, "আজকাল কে ডাকাত নয়—আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল নায়েবের চাউল খাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।" (ব. র., পৃ. ৭২২) ধর্মাচরণ নিয়েও কতো সহজ কৌতুক!

বাংলার নবাব ও বাঙ্গালীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন, "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" (ব. র., পৃ. ৭২২) এ-মন্তব্যে চোখে জল, ঠোঁটে হাঁসি!

মহেন্দ্র গৃহী; তার ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রকট। তাই অস্ত্র হাতে নিয়েও সিপাহী বধ করতে পারলোনা। অথচ ভবানন্দ তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছে, তাঁকে সহায়তা করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। উষ্ণ, উত্তপ্ত ভবানন্দ বলেছে, "সে বোধ যে তোমার আছে এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনূমান।" (ব. র., পৃ ৭২৪)

জীবানন্দ মহেন্দ্রের মেয়েকে মৃতা মার পাশে পেয়ে তার বোন নিমাই-মণির বাড়ীতে রাখতে এসেছে। নিমাই তাঁকে ভাত খেয়ে যেতে অনু-রোধ করায় জীবানন্দ দ্বিরুক্তি করলেন না। ভগ্নীপতি ও নিমাই উভয়ের অন্ন-ব্যঞ্জন শেষ হলে, নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁঠাল আছে।" নিমাই সে পাকা কাঁঠাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোনও আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁঠালটিকেও সেই ধ্বংশপুরে পাঠাইলেন।" (ব. র., পৃ. ৭৩৯) জীবানন্দর নামের সঙ্গে 'গোস্বামী' শব্দটি জুড়ে দিয়েই বঙ্কিম রঙ্গ করেছেন। কারণ পুরোহিত-মোল্লা-সাধু-সন্তরা ভোজ্য-বস্তুর প্রতি সর্বদাই অতি সহানুভূতি-সম্পন্ন।

আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের কাছে কাঞ্চন সানন্দে গ্রহণযোগ্য কিন্তু কামিনী অবশ্য পরিত্যজ্য। স্ত্রীজাতি এখানে অবলা এবং পুরুষের ধর্ম-সাধনার অন্তরায়। শান্তি ছদ্মবেশে সন্তান দলে যোগ দিতে এসেছে। সত্যানন্দ

সর্বজ্ঞ; সুতরাং ছদ্মবেশেও শান্তিকে চিনতে পারলেন এবং তাকে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন—"শান্তি বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী বাহুতে কি কখনও বল থাকে না?"
সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।" (ব. র., পৃ. ৭৫৩) উপরন্তু সত্যানন্দ বল্লেন মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে। সন্তান সম্প্রদায় কেন দাহ করিবে? এ-উক্তির যথার্থতা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সন্তান সম্প্রদায় তো মা ভবানীর সন্তান। সত্যানন্দর কথা শুনে শান্তি মনে মনে বলিল, "র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালি, না তোর মা পোড়াকপালি।" (ব. র., পৃ. ৭৫৪) শান্তির গুরুভক্তির প্রশংসা করা গেল না তবে হাসবার সুযোগ পেলাম।

কাপ্তান টমাসের সঙ্গে শান্তির বৈষ্ণবী বেশে সাক্ষাৎ হ'ল—
"সাহেব। টুমি আমার গোড়ে (ঘরে) থাকিবে?
শান্তি। কি, তোমার উপপত্নীস্বরূপ?
সাহেব। ইষ্ট্রির মটো থাকিটে পাড়—লেকিন সাদি হইবে না।
শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, আমাদের ঘরে একটা রাগী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।"(ব. র., পৃ. ৭৫৯) ফষ্টর সায়েবদের নিয়ে এ-রসিকতা শৈবলিনীও করেছে।

কোনও এক সময়ে ভবানন্দ গোস্বামী নগরে প্রবেশ করে এক গৃহাভ্যন্তরে দৃশ্যটি দেখলেন: "স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্কা মোটা সোটা, কালো কালো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্-ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাঠি বাজিতেছে, ফর-ফর করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল-গল করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তাহার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানা প্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে।...ঠাকরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিলে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না, কেন না, সক্‌ড়ি হাত, নিকেশ মসৃণ সেই চিকুর জাল হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল! বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না। কেন না

ঠাকরুণটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর দুঃসহভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপরে উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরম ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন এবং ভবিষ্যতে অষ্টহাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে, গোঁসাই ঠাকুর? এস এস। আমায় আবার প্রাতঃ প্রণাম কেন ভাই।" (ব. র., পৃ. ৭৬১) উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এ-বর্ণনা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করা গেলনা। ভাগিরথী তীরে সংক্ষিপ্ত বস্ত্র-ব্যবহারের রীতি আছে এবং পাক-সাফ থাকবার জন্য রাঁধুনী শ্রেণী অধিক ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর নিমিত্ত গামছাই পড়ে থাকেন। পাঁচহাত শাড়ী সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্পেশাল অর্ডার দিয়ে করিয়েছিলেন। বাজারে এ-মাপের শাড়ী আমরা খুঁজে পাইনি। 'আনন্দমঠে' যেখানে ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুর ছড়াছড়ি সেখানে এই নির্মলানন্দ প্রীতি উৎপাদন করে।

ভবানন্দ কল্যাণীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। কল্যাণী তাঁকে ধিক্কার দিচেছন, "যার বুকে কাদা পোরা কলসীবাঁধা সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে।" (ব. র., পৃ. ৭৬২)

তুমুল যুদ্ধের সময় ভবানন্দ বলছেন, "জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" (ব. র., পৃ. ৭৭২) এখানে ভাষায় না হলেও ভাবে গুরুচণ্ডালী দোষ দেখা যায়। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতিতে এ-রসবাক্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনা।

পরবর্তী প্রকাশিত উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী"। বিশেষ আদর্শ প্রচার সম্ভবতঃ এর মূল লক্ষ্য কিন্তু প্রফুল্ল জীবনবাদী প্রাণচঞ্চল চরিত্র হওয়ায় এখানে শিল্পরূপ প্রকৃতই উপভোগ্য। লেখক এ-উপন্যাসে সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার বর্ণনার জন্য দেবী সিংহ, ভবানী পাঠক ইত্যাদির নামোল্লেখ করেছেন সত্য, কিন্তু ইতিহাসের ব্যবহার ওই নাম আহরণ

পর্যন্তই, তার বেশী কিছু নয়। একটি অসম-সাহসিক অসহায় নারীকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে আবার তাকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। এ-নারীত্বের অবমাননা নয়, বরং জীবনের তাগিদে এ-চরিত্র মহিমান্বিত। একটি শান্তি-সুখের নীড়ের জন্য দেবী রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে এসেছে। এই-ই নারীর চির-আকাংক্ষিত সুখ।

যাই হোক, শ্বশুর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা প্রফুল্ল মাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো কিন্তু মা বেশীদিন বাঁচলেন না। এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন, "পাড়ার পাঁচজন যাহারা তাঁহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মায়ের সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এ সময়ে শত্রুতা রাখেনা। বাঙ্গালী জাতির সে-গুণ আছে।" (ব. র., পৃ. ৮০১) এখানে কিন্তু ঔপন্যাসিক সহজ রঙ্গপ্রিয় নন, কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গপ্রিয়।

দুর্লভচন্দ্র প্রফুল্লকে জমিদারের কাছে ভেট-স্বরূপ নেবার পথে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হ'ল। সঙ্গে তার প্রণয়িনী ফুলমণিও ছিল। ঔপন্যাসিকের মন্তব্য, "ফুলমনি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। ফুলমণি যত ডাকে, "ওগো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেওনা গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবাগো, ঐ এলো গো!" কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া পগার লাফাইয়া কাদা ভাঙ্গিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, ... তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, " ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়ে মানুষকে ভুলিয়ে এনে এমনি করে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে।" (ব. র., পৃ. ৮০৭) এ-অংশ অনবদ্য। ফুলমণি ভুলে গেছে মিন্‌সে ওকে আনেনি, ওই স্বেচ্ছায় মিন্‌সের কাছা ধরেছিল।

প্রফুল্লকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে ভবানী পাঠক তার কাজ করবার জন্য গোবরার মা নামে একজন পরিচারিকা পাঠিয়েছেন। সে কোন কাজই করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত বললো, "সলতে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো গাতা ফেলব আর আসল কাজ যা যা তা করব, হাট করব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পারবে ?

গো-মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি? তবে কড়িপাতি যা দেবে তা সব খরচ করে আসব,—তুমি বলতে পারবে

না যে, আমার এই খরচটা হ'ল না।" (ব. র., পৃ. ৮১২) এখানে উচ্চকণ্ঠে হাসলেও মানা নেই।

প্রফুল্লর মৃত্যু-সংবাদ তার শ্বশুর-গৃহে এসে পৌঁছল—"হরবল্লভ শৌচ স্নান করিলেন কিন্তু শ্রদ্ধাদি নিষেধ করিলেন; "বাগ্‌দীর শ্রাদ্ধ বামুনে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল। তারপর—

—মাথা মুছিয়া বলিল, "আর একটার জন্য নাইতে পারলেই শরীরটা জুড়ায়।" (ব. র., পৃ. ৮০৫) অর্থাৎ এক সতীন গেল, আরেকজন গেলেই পরম শান্তি।

ওজনের তুলাদণ্ডে পিতার নিকট স্ত্রী মূল্যহীন। "প্রফুল্লর জন্য যখন কান্না আসিত তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য (ব্রজেশ্বর) বলিতেন—

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপান্ন প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

—এ ধর্মবোধ বঙ্কিমের কৌতুক দৃষ্টি এড়ায়নি।

"বড় ধুম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ী তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিলনা। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।··· দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইসের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক্ হইয়া উঠিল; সে কখনও এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাহতে এক সের মিশাইয়া বসে।" (ব. র., পৃ. ৮২১) নিছক হাল্‌কা রসিকতা।

'দেবী চৌধুরাণী'র লোকেরা ব্রজেশ্বরের নৌকা আক্রমণ করেছে—"রাম সিং ছাদের উপর হইতে বলিল, 'ধর্ম্মাবতার! শালা লোক সব কোইকে বাঁধকে রাক্‌খা।' ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীর পুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।" (ব. র., পৃ. ৮২৬)

ব্রজেশ্বর নিশির সঙ্গে আলাপ করছেন—

"নিশি।...পুরুষ মানুষ স্ত্রী লোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর-সংসার চলেনা—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সক্‌ড়ি হয়—মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটি-বাটি তফাৎ কর—কি জানি, যদি সক্‌ড়ি হয়।...

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষ মানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পুরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

তখন নিশি বলিল, "ঠিক বলিয়াছিস—তাই মেয়েমানুষে এ জিনিস গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই, তোর কলসী, কলসী পিঁড়ির উপর তুলিয়া রাখ।" (ব. র., পৃ: ৮৩৩)

ব্রজেশ্বরকে সুগন্ধি তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করলেন নিশি। সাগরকে বল্লেন, "তুই পোড়ামুখী আর দাঁড়াইয়া কি করিস—পুরুষ মানুষে হুঁকার নল মুখে করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাঁই দেয়।" (ব. র., পৃ. ৮৩৪) ধূমপানের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ সকল গৃহিণীরই। দেবী ব্রজেশ্বরকে ধন দিলেন, এক্ষণে—"ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলিনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্যের "বিদায়" বা "মর্যাদা" গ্রহণে লজ্জা ছিলনা। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন "এ কি এ? কলসীটা নিরেট নাকি?" (ব. র., পৃ. ৮৩৫)

দেবী, দিবা ও নিশি শাস্ত্রালোচনা করছেন:
"নিশি। এ ত গেল পাঁচ রকম প্রত্যক্ষ। ছয় রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি কেন না, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্‌ ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, জান না?
দিবা। কি, দাঁত?
নিশি। দূর হ পোড়ার মুখী। ইচ্ছা করে, কিল মেরে তোর সে ইন্দ্রিয়ের পাটিকে পাটি ভেঙ্গে দিই। (ব. র., পৃ. ৮৫৬) এমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে রস পরিবেশন সহজসাধ্য নয়।

হরবল্লভের সঙ্গে নিশির আচরণের পর দেবী বলেছে, "নিশি ঠাকুরাণী! তোমার মন প্রাণ, জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—

কেবল জুয়াচুরিটুকু বাদ। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছ।" (ব. র., পৃ. ৮৬৩)

ব্রজেশ্বর বজরার ছাদে, হরবল্লভ ভিতরে। দেবী নিশিকে বলল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।
দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন?
নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া, লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না?" (ব. র., পৃ. ৮৬৩) রঙ্গরসের সুযোগ উপস্থিত হলেই বঙ্কিমচন্দ্র তার সদ্ব্যবহারে কুণ্ঠা-বোধ করেননি।

সতীন এসেছে। ঔপন্যাসিক নয়নতারার অবস্থা বর্ণনা করছেন—"সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে সে যেমন গর্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল।" (ব. র., পৃ. ৮৬৯)

দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্কাম ধর্ম-সাধনার আদর্শ প্রচারিত হয়েছে সত্য, কিন্তু নিশি ঠাকুরাণীর মত বঙ্কিমচন্দ্রও রঙ্গরসের জুয়াচুরিটুকু পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

সর্বশেষ আলোচ্য 'সীতারাম' উপন্যাস। রামরাজত্ব স্থাপন পরিকল্পনাতেই এ-উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয়েছে। দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্কাম ধর্ম-সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেবী স্বামীগৃহে ফিরে এসেছেন। দেবী হয়েছেন মানবী, কিন্তু সীতারামের 'শ্রী' এর ব্যতিক্রম। গার্হস্থ্য-জীবন শ্রীর জন্য পরিত্যজ্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লনা। শ্রী অন্দরে বন্দী হলেন ধর্মরাজ্য পরিচালনার ইচ্ছায়।

শ্রী সীতারামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কিন্তু ভাণ্ডারী অনুমতি দানে অনিচ্ছুক—"শ্রী গলাপর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষ ভাবে বলিল, "ও ভিক্ষে-পিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।" পাঁচকড়ির মা তখন অস্ফুট স্বরে ভাণ্ডারী মহাশয়কে বলিল "ভিক্ষে যদি কিছু পায় ত অর্দ্ধেক তোমার।" (ব. র., পৃ. ৮৭৫) রাজদ্বারে মূল্য না দিয়ে কে কবে প্রবেশ করতে পেরেছে?

গুরু ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড়ের পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক—"আমরা আজি-কার দিনেও এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।" (ব. র., পৃ. ৮৭৬)

শ্রী-বিস্মৃত সীতারাম সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য : "যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা, আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়েনা। যার এক দিকে নন্দা, আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে ?" (ব. র., পৃ. ৮৮৫) সামান্য উপমার সহায়তায় সীতারাম-চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে।

রমা মুসলমানকে বড় ভয় পায়। এ-কারণে সীতারামকে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। সীতারাম রমার কাছে যেতেন না—"তখন রমা যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তারপর সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া—ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান্— কখনও মুষলধার, কখনও ইলসে গুড়ুনি, কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্তিকে ঝড়।" (ব. র., পৃ. ৮৮৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে রমার আচরণের তুলনা করে কৌতুক-রস পরিবেশন করা হয়েছে।

শ্রী ও জয়ন্তীকে দেখে উড়িষ্যাবাসীদের বাক্যালাপ প্রচুর হাসির উপাদান যুগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হউ হউ যাঃ যাঃ সেঠিরে তা ভোঁউরি (সুভদ্রা) আছি। তুমনঙ্কো মারি পকাইব।" (ব. র., পৃ. ৮৯২)

গঙ্গারামকে অন্দরে রমার সাক্ষাতে নেবার জন্য মুরলা পাঁড়েজীকে তোষামোদ করছে—

"মু। তোর কিরে বিট্‌লে? খাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লোকেন জানকাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান আছে নাকি? আমি ত তোর জান।

পাঁড়ে। তোম ছোড়নেসে মরেঙ্গে নেহি, লেকিন জান ছোড়নেসে সব আঁাধিয়ারা লাগেগী। (ব. র., পৃ. ৯০৫) পাঁড়েজী জীবনের সার-সত্য বুঝেছে।

শ্রী এবং সীতারামের সাক্ষাৎ হ'ল—

"শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"···সীতারামের মনে হইল উত্তর করেন, "কড়ি কাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।" করুণ ভাব-গম্ভীর পরিবেশেও কি রঙ্গ-কৌতুক।

অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ রঙ্গ-প্রিয় বঙ্কিমের মনোলোক এবং শিল্পী-জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করা হ'ল। মহাসমুদ্রে এ রত্ন-ভাণ্ডারের অবস্থান। আমি শুধু সাগরের বেলাভূমি থেকে কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহ করলাম।